

Vol. 26 | No. 2 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ছাপাখানা ও প্রকাশনার আদিপর্ব

Volume	26
Issue	2
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ, হাবীবুর রশিদ
Published online	April 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v26i2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i2.10
Pages	140-161
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা ছাপাখানা ও প্রকাশনার আদিপর্ব

রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ

অনুবাদকের কথা

এ-উপমহাদেশের ইতিহাসে সিপাহী-বিদ্রোহ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বিদ্রোহের তীব্রতা ও দ্রুত বিস্তৃতিতে প্রথমে হতচকিত হয়ে গেলেও পরে ভীষণ নির্দয়তার সঙ্গে এই বিদ্রোহ দমন করে এবং ভবিষ্যতে যেন কেউ অনুরূপ বিদ্রোহ করার দুঃসাহস না দেখায় সে উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি অমানবিক অত্যাচার চালায়। কিন্তু বিজয়ী জাতির সীমাহীন অত্যাচার-উৎপীড়ন ও ক্ষমতার দম্ভ যে বিজিত জাতিকে মরিয়া করে তোলে এবং অধিকতর হিংসাত্মক প্রতিরোধের পথে দ্রুত পরিচালিত করে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সে-তত্ত্ব অজানা ছিল না। তাই তাদের কৃত নৃশংসতা ও রক্তপাতের ক্ষতিপূরণমূলক আচরণ হিসেবে তারা তৎক্ষণাৎ কয়েকটি শাসন-সংস্কারের কথা ঘোষণা করে। নেটিভদের জন্য আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, উচ্চতর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ দেওয়া এবং ধর্মাচারণের অবাধ স্বাধীনতা প্রদানের কথাও বলা হয়। মহারাণী তড়িঘড়ি করে প্রজাদের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং সাম্রাজ্যের সকল নাগরিকের জন্য ন্যায় বিচার ও নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। বলাবাহুল্য, ইংরেজের এ-সব পদক্ষেপ খুবই সময়োচিত হয়েছিল। 'ঘুষি খাওয়া'র সঙ্গে সঙ্গেই 'কিছু ভূষি' পেয়ে তৎকালীন সুবিধাভোগী দালাল-আমলা-বেনীয়ান-মুৎসুদ্দী শ্রেণীর লোকেরা যে কিছু কালের জন্য হলেও স্বস্তি বোধ করেছিল, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তার প্রমাণ আছে।

ভারতবর্ষের প্রজাপুঞ্জের প্রতি আপাত উদার আচরণের আড়ালে ইংরেজ রাজশক্তি তখন তার সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের নড়বড়ে খুঁটিগুলিকে একটা পাকাপোক্ত ভিত্তিতে স্থাপন করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এ-দেশবাসীর কাজে ইংরেজ সরকার এক জবরদখলকারী বিদেশী শক্তি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কাজেই সেই সরকার অস্ত্রে এবং শাস্ত্রে যত পরাক্রমশালী ও উন্নতই হোক না কেন, তার শাসন দীর্ঘস্থায়ী ও নিষ্কণ্টক করতে হলে বিজিত জনসাধারণের সমর্থন তার জন্যে অপরিহার্য ছিল। এ কারণেই ইংরেজশক্তি তখন এদেশে তাদের অনুগত একটি শ্রেণী সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়। এ পক্ষে পূর্ব থেকেই শহর কলকাতায় ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইংরেজী সংস্কৃতির অনুরাগী একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। তাছাড়াও ছিল দেশের সর্বত্র জমিদার শ্রেণী, সরকারের রাজস্ব আদায়কারী রূপে তারা ইংরেজের সৌভাগ্যের কিঞ্চিৎ অংশ পেত। কিন্তু তাদের সর্বমোট সংখ্যা কতই বা ছিল। এ দেশে ইংরেজের অনুগত নতুন শ্রেণী সৃষ্টির বিষয়ে ইংরেজ প্রশাসকগণও অবশ্য সিপাহী বিদ্রোহের আগে থেকেই সচেতন ছিলেন। লর্ড মেকলে একটি পরগাছা-শ্রেণী সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তাঁর বহু নিন্দিত শিক্ষা-নীতি তৈরী করেছিলেন। তাঁর সে নীতি ছিল বাহ্যত

আধুনিক, কার্যত ইংরেজের দাসত্বমূলক এবং প্রকৃতপক্ষে মৃত-বৎসা। মেকলে বলেছিলেন :

"We must do our best to from a class who may be interpreters between us and the millions who we govern ; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect."

এ-নতুন শিক্ষাব্যবস্থা কার্যকরভাবে দেশের সর্বত্র চালু করতে হলে তার জন্যে যথোপযুক্ত পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িক-পত্রের সুষ্ঠু প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক ছিল। মুদ্রিত পুস্তক ও সংবাদপত্রাদির আঁতুড় ঘর হচ্ছে ছাপাখানাসমূহ। তাই এদেশের জনশিক্ষা এবং জনমতকে তাদের ইপ্সিত লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালনা করার জন্যে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী এদেশীয় ছাপাখানাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। এ-উদ্দেশ্যে তারা বঙ্গদেশের ছাপাখানাগুলির প্রকৃত অবস্থা, প্রকাশিত গ্রন্থাদির সংখ্যা ও শ্রেণী এবং পত্র-পত্রিকাগুলির মতাদর্শ ও প্রচার-সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ-কাজের জন্যে ইংরেজ সরকার খ্রীস্টান পাদরী রেভারেন্ড জেমস্ লঙ্‌কেই (১৮১৫-১৮৮৭) যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করে এ-দায়িত্ব তাঁরই উপর ন্যস্ত করে।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী এবং গবেষক হিসেবে রেভ. জেমস্ লঙ্-এর নাম এদেশে অতিশয় সুপরিচিত। একজন ইউরোপীয় হয়েও তিনি দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সে জন্যে তাঁকে এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও এক মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ-ঘটনার কথা বাদ দিলেও, উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলাসাহিত্য, বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা, বাংলা সংবাদপত্র, দেশীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে নিষ্ঠা ও শ্রম সহকারে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার জন্যেও পাদরী জেমস্ লঙ্-এর নাম স্মরণীয়। "A Return of the names and writings of 515 persons connected with the Bengali Literature during the last fifty years (Calcutta, 1568)" লঙ্-এর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে লঙ্ সাহেবের গ্রন্থপঞ্জীটি প্রয়োজনীয় তথ্যের একটি মূল্যবান ভাণ্ডার। গবেষণামূলক লেখা ছাড়াও তিনি 'ধাতুমালা', 'দৃষ্টান্ত রত্ন' প্রভৃতি ছাত্র-পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। ১৮৫০ সাল থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'সত্যার্ণব' নামে একটি সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই বিদেশীয়-কর্মী ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডে পরলোকগমন করেন।

সরকার-কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে লঙ্ সাহেব ১৮৫৭ সালের প্রকাশিত বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকার একটি বিবরণ সংকলন করেন। এই বিবরণের অন্তর্ভুক্ত ছিল ১৮৫৭ সালে কলকাতায় কার্যরত মুদ্রণালয়সমূহের তালিকা এবং তাদের প্রকাশিত পুস্তকসমূহের নাম। এ-ছাড়াও এতে ছিল পুস্তকসমূহের শ্রেণীভিত্তিক বিশদ বর্ণনা এবং ছাপাখানাসমূহের অতীত অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা।

যে-কালে জেম্‌স্ লঙ্ অত্যন্ত অধ্যবসায় ও শ্রম সহকারে এদেশীয় ছাপাখানাগুলি সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন, সে-কালের পরিবেশে সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা যে কিরূপ বিড়ম্বনাদায়ক ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথমতঃ অধিকাংশ দেশীয় (অর্থাৎ বাংলা ভাষার) ছাপাখানা দরিদ্র ও অপরিচ্ছন্ন মহল্লায় অবস্থিত ছিল বলে সকল ইংরেজের পক্ষে সে-সব জায়গায় যাতায়াত করা খুব রুচিকর ব্যাপার

ছিল না। খ্রীস্টান মিশনারী ছিলেন বলেই লঙ্ সাহেবের পক্ষে যাতায়াত সম্ভব হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ছাপাখানার মালিকেরা কিছুতেই সঠিক সংখ্যা ও তথ্যাদি প্রকাশ করতে রাজী হত না। তারা আশঙ্কা করত যে এর ফলে তাদের ট্যাক্স বেড়ে যাবে। তৃতীয়তঃ মালিকেরা তাদের প্রকাশিত বই-পত্রের যথাযথ হিসাবপত্র নিজেরাই রাখত না। এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও লঙ্ সাহেব একাধিকবার বিভিন্ন ছাপাখানায় নিজে গিয়েছেন কিংবা সরজমিনে লোকজন পাঠিয়ে তথ্যাদির যথার্থতা সযত্নে যাচাই করতে কসুর করেন নি বলে দাবী করেছেন। সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা একজন বিদেশীয় গবেষকের পক্ষে যে কত কঠিন কাজ ছিল তা বিশেষভাবে বুঝা যায় যখন আমরা দেখি যে এত সতর্কতা সত্ত্বেও এ তালিকায় বেশ কিছু সংখ্যক ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে। অনেক গ্রন্থের নাম ভুল লেখা হয়েছে, কোন কোন গ্রন্থের নামে রয়েছে অসম্পূর্ণতা এবং উল্লেখিত পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে রয়েছে বিস্তর অসঙ্গতি।

লঙ্ সাহেব তাঁর ছাপাখানা ও পুস্তকের তালিকায়[১] নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ সংকলন করেছেন :

(ক) ছাপাখানার নাম ও অবস্থান, (খ) পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকার নাম, (গ) মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা, (ঘ) লেখকের নাম ও (ঙ) বিষয়বস্তু।

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত পুস্তকের বিবরণীর মুখবন্ধ হিসেবে এর সঙ্গে ছিল ৬৩ পৃষ্ঠা দীর্ঘ এক ভূমিকা—'বঙ্গ দেশীয় ছাপাখানাগুলির সম্পর্কে প্রতিবেদন'[২]। এই প্রতিবেদনে লঙ্ সাহেব তৎকালীন বাঙালী সমাজ ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, দেশীয় ছাপাখানাগুলির কর্মতৎপরতা, প্রকাশিত পুস্তকসমূহের বিষয়বস্তু ও শ্রেণীবিভাগ, সংবাদপত্রগুলির মতাদর্শ, ছাপাখানা ও প্রকাশনার অতীত এবং ভবিষ্যৎ, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় তাঁর সংগৃহীত তথ্যের আলোকে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন।

যতদূর জানা যায় প্রথম বাংলায় মুদ্রণ আরম্ভ হয় কলকাতায় জেমস্ আগাস্ট হিকি স্থাপিত ছাপাখানায় ১৭৭৮ সালে। আর এদেশে প্রথম কাগজের কল স্থাপন করেন শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮১০ সালে। জেমস্ লঙ্-এর মতে ১৮৫৭ সাল নাগাদ কলকাতায় মুদ্রণ ও কাগজ শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ঐ-সালে কলকাতার ছাপাখানা-গুলি থেকে সাড়ে তিনশত বাংলা পুস্তকের প্রায় চল্লিশ হাজার কপি বিক্রয়ের জন্যে মুদ্রিত হয়েছিল। তা ছাড়া, সে-সময়ে ঢাকা, রংপুর প্রভৃতি জায়গায়ও ছাপাখানা চালু ছিল এবং এ-সব ছাপাখানা থেকে নিয়মিতভাবে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হত।

দেশীয় ছাপাখানাগুলি থেকে প্রচুর পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হলেও আশ্চর্যের বিষয় তখন পর্যন্ত বাংলা পুস্তক বিক্রয়ের জন্যে কলকাতা শহরেও কোন দোকান-পাট ছিল না। বাংলা পুস্তক বিক্রি হত হকারদের মাধ্যমে। তারা বই-পত্রের বোঝা মাথায় করে অলিতে-গলিতে গ্রামে-গঞ্জে বই ফেরি করে বিক্রি করত।

লঙ্ সাহেবের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে সে-সময়ে মুসলমানী বাংলায় (প্রচুর ফারসী ও উর্দু মিশ্রিত বাংলায়) মুসলমান ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন পুস্তকের ২৪,৬০০ কপি বিক্রয়ের জন্যে মুদ্রিত হয়েছিল। লঙ্ সাহেব তাঁর তালিকায় এ-সকল পুস্তকের ৪১টির নাম উল্লেখ করেছেন। এ-সব পুস্তক সাধারণতঃ মুসলমান মাঝি, ভৃত্য ও দোকানদার শ্রেণীর লোকেরাই পাঠ করত। মুসলমান ভদ্রলোকেরা তখন একমাত্র ফারসী ভাষাতেই কাজ করতেন। ইংরেজী স্কুলে পড়াশোনা করতে তারা সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন। লঙ্ সাহেবের মতে সেকালের মুসলমানেরা ছিল "স্বপ্নগ্রস্ত"।

অনুমান করা কঠিন নয় যে সিপাহী বিদ্রোহোত্তর কালে বিজিত মুসলমান এবং বিজয়ী ইংরেজ জাতির মধ্যে পারস্পারিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। সে কারণেই ছাপাখানার মুসলমান মালিকদের সম্বন্ধে লঙ্ সাহেবের মন্তব্য—"I would be unwilling to take returns and descriptions from Mohammedans on mere trust,—I found too a reluctance to afford me any information"—সহজেই বোধগম্য।

জেমস্ লঙ্-এর মতে মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে অফিস আদালত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। ব্রাহ্মণেরা এ-ভাষাকে ঘৃণার চোখে দেখত। খ্রীস্টান মিশনারীদের আগে এ-ভাষার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদি প্রণয়ন এবং এ-ভাষাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বাহন করার বিষয়কে কেউ গুরুত্ব দেয় নি। তাছাড়া, মিশনারীরাই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে এদেশীয় লোকেরা ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া করতে আসে জ্ঞানার্জনের জন্যে নয়, জীবিকা উপার্জনের পথ সুগম করার জন্যে। ফলে ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা স্বদেশীয় ভাষা ও স্বজাতিকে ঘৃণা করতে শেখে। তবে ইংরেজী শিক্ষার ফলে তাদের মনের যে জাগরণ ঘটে তার দরুণ তাদের পক্ষে মাতৃভাষার চর্চা অধিকতর আনন্দদায়ক হয়ে উঠতে পারে। দেখা গিয়েছে যে, এ-যুগে যাঁরা উৎকৃষ্ট মানের বাংলা বই লিখেছেন তাঁরা সবাই ছিলেন ইংরেজীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। লঙ্ সাহেব রামমোহন রায়ের প্রশংসা করেছেন এ জন্যে যে তিনি "তাঁর মায়ের শেখান ভাষার" গুরুত্ব সম্যক-অনুধাবন করেছিলেন এবং এ ভাষাতেই তিনি নারী ও বিধবাদের অধিকারের জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন।

আলোচ্য তালিকায় দেখা যায় যে খ্রীস্টান মিশনারীরা মুসলমানী বাংলায়ও তাদের ধর্মীয় পুস্তকাদি প্রণয়ন করেছিলেন। তাছাড়া রোমান হরফে বাংলা চালু করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে কিছু উৎসাহী লোক বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। এ নিয়ে প্রায় পঁচিশ বছর যাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। রোমান হরফে ৮টি পুস্তকের ১৮৩৭ কপি মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানী বাংলায় খ্রীস্টান ধর্মীয় পুস্তক রচনার মতই, বাংলা হরফের রোমানীকরণ-প্রচেষ্টা বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি। পঁচিশ বছর প্রচেষ্টা চালাবার পর জনৈক ডক্টর ডাফ এ সম্পর্কে লিখেছেন, "এ দেশীয় লোকেরা এতদ্‌সত্ত্বেও নিজেদের ভাষার বর্ণমালাই ব্যবহার করে যাচ্ছে। রোমান হরফের মধ্যে কেমন যেন একটা বেশী রকমের বিদেশী গন্ধ এবং একটু বেশী জবরদস্তিমূলক নতুনত্বের ভাব আছে, যার জন্যে এখানকার লোকদের বুদ্ধি-প্রকৃতির সঙ্গে তা খাপ খায় না।"

লঙ্ সাহেব তাঁর এই বিবরণ যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংকলন করেছিলেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই বিবরণে যে অনেক ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তবু একথা অনস্বীকার্য যে এদেশীয় ছাপাখানা ও তাদের প্রকাশিত গ্রন্থাদি সম্পর্কে এমন জরীপ পূর্বে আর কেউ কখনো করেননি।

১৮৫৭ সালের সিপাহী-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরবর্তী কালের বাংলা মুদ্রণালয়গুলির কর্মতৎপরতা ও তাদের দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তক-সম্বন্ধে যথার্থ তথ্যের জন্যে তৎকালীন ইংরেজ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত লঙ্ সাহেবের এই বিবরণ একটি নির্ভরযোগ্য উৎস। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য এবং বাংলা ছাপাখানার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যারা জানতে আগ্রহী তারা এ বিবরণ পড়ে উপকৃত ও আনন্দিত হবেন।

হাবীবুর রশিদ

বঙ্গদেশীয় ছাপাখানাসমূহ-সম্পর্কে প্রতিবেদন

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলে বাংলা সংবাদপত্রসমূহ সম্পর্কে এই প্রতিবেদন[৩] তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু এই গবেষণামূলক প্রতিবেদনটি তৈরী করতে যে-পরিমাণ পরিশ্রম হবে বলে গোড়াতে আন্দাজ করেছিলাম, আসলে কাজটি ছিল তার চেয়েও অনেক বেশী পরিশ্রম সাধ্য। বিদ্রোহের সময়ে এদেশীয় পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে অনেক কথা বলা এবং লেখা হয়েছিল। অনেকে সাত তাড়াতাড়ি মন্তব্য করেছিলন। কেউ কেউ বলেছিলেন যে, দেশীয় ছাপাখানাগুলি এতই দুর্নীতিপরায়ণ যে এগুলো উঠিয়ে দেওয়াই উচিত। এই কারণে, এবং পরিসংখ্যানগত কারণেও বটে, দেখা গেল যে, দেশীয় ছাপাখানাগুলি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করে বিষয়টি যাচাই করে দেখা দরকার। বঙ্গদেশের লেফটান্যান্ট গভর্নর এবং জনশিক্ষা পরিচালক মহোদয়গণও এ বিষয়টি সানন্দে অনুমোদন করেছেন। সরকার ইতিপূর্বে "Selections of the Bengal Government, No. XXII" পুস্তকে বর্তমান লেখক কর্তৃক সংকলিত ১৮৫৩ সালের দেশীয় ছাপাখানাসমূহের বিবরণী প্রকাশ করেছেন। ১৮৫৭ সালে কলকাতায় কার্যরত মুদ্রণালয়সমূহের তালিকা এবং তাদের দ্বারা মুদ্রিত বইপত্রের নাম ও বিষয়াদি আলোচ্য বিবরণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও এতে আছে পুস্তকসমূহের শ্রেণী-ভিত্তিক বিশদ বর্ণনা এবং ছাপাখানাসমূহের অতীত অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি আলোচনা।

২. বিগত পঁচিশ বছরে যে সকল বাংলা পুস্তকের কপি মুদ্রিত ও বিক্রীত হয়েছে তাদের মোট সংখ্যা ৮০,০০,০০০-এর চেয়ে কম হবেনা। অপরদিকে, গত অর্ধ-শতাব্দীতে রচিত মৌলিক গ্রন্থ কিংবা সংস্কৃত, ইংরেজী ও ফারসী থেকে অনূদিত পুস্তকের সংখ্যা ১,৮০০-এরও বেশী হবে। এ সমস্ত বই প্রকাশনা ও বিক্রয়ের কাজে এক বিপুল জনশক্তি নিয়োজিত আছে। অথচ এ দেশের অধিবাসীদের চিন্তাস্রোতকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য আমরা ইতিপূর্বে কত সামান্য পদক্ষেপই না গ্রহণ করেছি। ইংরেজ জনসাধারণের খাদ্য যদি বৃটিশ আইনসভার দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় তাহলে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের মনের খাদ্য এবং তার সরবরাহকারী দেশীয় ছাপাখানাগুলির বিষয়ও অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখার উপযুক্ত বলে গণ্য হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এ-দেশীয় গণ-মানসের মুখপত্র হিসেবে এখানকার ছাপাখানাগুলির দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। এ-সব ছাপাখানার সুস্থ অংশটিকে যদি কর্তৃপক্ষ উৎসাহ প্রদান করেন তাহলে এর দ্বারা অনেক উপকার সাধিত হতে পারে। পক্ষান্তরে, একে যদি অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তা অশেষ অকল্যাণের উৎস হয়ে দাঁড়াবে। সম্প্রতি কিছু সরকারী কর্মকর্তা দেশীয় ছাপাখানাগুলিকে দমন করে কিংবা তাদের উপর কড়া সেন্সর ব্যবস্থা আরোপ করে এই জটিল অবস্থা নিরসনের একটা প্রস্তাব দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এ জাতীয় ব্যবস্থা গৃহীত হলে তা সদাশয় সরকার এবং সুস্থ শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষে যে কিরূপ আত্মঘাতী হবে আলোচ্য প্রতিবেদনের উপর একবার নজর দিলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।[৪]

৩. ভারতবর্ষের স্থানীয় ছাপাখানাগুলির পরিসংখ্যানের দিকে সরকারের দৃষ্টি রয়েছে। অনেক বছর আগে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস স্থানীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদির কপি নিয়মিতভাবে তাদের কাছে পাঠাবার জন্যে ভারত সরকারের সচিবদের প্রতি যে

সার্বক্ষণিক আদেশ প্রদান করেছিল তাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। "কলকাতার বাংলা প্রেস থেকে প্রকাশিত সকল প্রকার মৌলিক বাংলা পুস্তকের এক কপি করে বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউজ লাইব্রেরীকে সরবরাহ করার জন্য" ১৮৫৬ সালে তারা নির্দেশ জারী করেন। সরকার এক প্রস্থ বাংলা বই প্যারিস প্রদর্শনীতেও পাঠিয়েছিলেন এবং ২২ সংখ্যক "সিলেকশন্‌স্ অব দি বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট" পুস্তিকাটিতেও বাংলা ছাপাখানা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন।

আগ্রা সরকার তাদের ৩১ সংখ্যক 'সিলেকশন'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন "ফারসী ও দেশীয় ভাষাসমূহের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে এ সকল প্রদেশে যে সমস্ত গ্রন্থ অদ্যাবধি সংকলিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর কর্তৃক নিয়োজিত কমিটির রিপোর্ট"[৫]। সম্প্রতি তারা প্রকাশ করেছেন ই. হল সংকলিত "ভারতীয় দর্শন পদ্ধতির গ্রন্থপঞ্জীর জন্য একটি নির্ঘণ্ট তৈরীর ক্ষেত্রে অবদান"। ভারত সরকার নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেছেন ডক্টর স্প্রেন্‌জারের ৬৪৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'লক্ষ্ণৌর গ্রন্থাগারগুলির পাণ্ডুলিপিসমূহের তালিকা"[৬]। সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকার প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন সেইন্ট জর্জ কলেজ গ্রন্থাগারের প্রাচ্য-দেশীয় পাণ্ডুলিপিসমূহের ৬৭৮ পৃষ্ঠা-সম্বলিত বিশদ তালিকা (১ম খণ্ড)। উপরোক্ত দুটি গ্রন্থই গভীর গবেষণামূলক এবং মূল্যবান রেফারেন্সী গ্রন্থ। প্রসঙ্গক্রমে এই রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে অত্র লেখকের জন্যে ভারত সরকারের বদান্যতায় সংগৃহীত মাদ্রাজ ছাপাখানার বিবরণটিও দেখা যেতে পারে।[৭]

৪. পাঞ্জাব ও আগ্রা প্রেসিডেন্সির কিছু সংখ্যক স্থানীয় সংবাদপত্র সরকারের সম্পর্কে লাগাম বিহীন উক্তি করায় তাদের উপর সেন্সর ব্যবস্থা আরোপ করার জন্যে কোন কোন মহলে যেরূপ কথা হচ্ছে তাতে ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল থেকেই বর্তমান প্রতিবেদনটির অনুরূপ বিবরণ সংগ্রহ করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

কেবলমাত্র স্থানীয় লোকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমন একটি পদক্ষেপ ভীষণ অশান্তি ডেকে আনবে এবং এর দ্বারা তাদের গোপন পত্রযোগাযোগ ও সাংস্কৃতিক ভাষা ব্যবহারের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। এ আদেশ কার্যকর করতে গেলে খুবই অসুবিধায় পড়তে হবে। কে সেন্সরের কাজ করবেন ? সরকারের সচিবগণ নিশ্চয়ই নন। তাদের উপর তো বিভিন্ন রকমের কাজের বোঝা আগেই চাপিয়ে রাখা হয়েছে। সেন্সরের কাজ করার মত অবকাশ বা সামর্থ্য খুব কম ইউরোপীয়েরই আছে। তাছাড়া দেশীয় লোকদের ভাবাবেগ মহারাণীর ঘোষণার সঙ্গে যতই সঙ্গতিপূর্ণ হোক না কেন অনেক ইউরোপীয়ের দৃষ্টিতেই তা রাজদ্রোহিতা এবং নিন্দনীয়। প্রকৃতপক্ষে দেশীয় প্রেসের মতামতকে অনেক ক্ষেত্রেই বিপদ-সংকেতজ্ঞাপক রক্ষাকবচ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ১৮৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীর স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি পাঠ করলে কর্তৃপক্ষ জানতে পারতেন যে দেশীয়-লোকেরা তখন বিদ্রোহের জন্য দস্তুর মত প্রস্তুত ছিল এবং তারা পারস্য ও রাশিয়া থেকে সাহায্যও প্রত্যাশা করেছিল।

৫. এ-ছাড়াও, এ-জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এখন উপযুক্ত সময় নয়। এখন দেশীয় ছাপাখানাগুলি তাদের প্রকাশিত বইপত্রের সংখ্যা ও মানের দ্রুত উন্নতি সাধন করছে।[৮] গত বছর আগ্রা প্রেসিডেন্সিতে জনশিক্ষা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে দেশীয়-ভাষায় শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচিত হয়েছে ১০৮টি এবং মুদ্রিত হয়েছে ৭,০০,০০০ কপি। ঐ একই সময়ে কলকাতার মুদ্রণালয়গুলি থেকে প্রকাশিত হয়েছে বিবিধি বিষয়ে প্রয়োজনীয় অজস্র পুস্তক। আমাদের ধারণা, বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করার একটি উপায়

হচ্ছে সরকার কর্তৃক ইতিপূর্বে আরব্ধ কাজটি সমাপ্ত করা। অর্থাৎ, ভাল ভাল দেশীয় সাময়িকী ও সংবাদপত্রগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদান করে যাওয়া। এ ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে ব্যয়ের তুলনা করা উচিত হবে না। ব্যাধি নিরাময় করার চেয়ে ব্যাধি নিবারণ করা সর্বদাই শ্রেয়। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকাটি বর্তমানে সরকারের কাজ থেকে মাসিক মঞ্জুরী পেয়ে থাকে। এ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ৫৫০। আমাদের বিশ্বাস, সেদিন সুদূর নয় যেদিন সঠিক সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং জনসাধারণকে সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য এ-পত্রিকা দেশের প্রতিটি থানায় পাঠান হবে।[৯] মাদ্রাজ সরকার একটি বহুল প্রচারিত তামিল সংবাদপত্রকে সাহায্য দিয়ে থাকেন। এ পত্রিকাটি প্রসঙ্গে জনশিক্ষা পরিচালক তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন "শিক্ষা কিংবা রাজনীতি যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা যাক না কেন এ-জাতীয় মঞ্জুরীর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।" এমনকি নিউজিল্যাণ্ড সরকারও সে-দেশীয় লোকদের জন্যে তাদেরই ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

তাই আমাদের এখন প্রয়োজন একটি বেঙ্গল মনিটরের এবং সেই সঙ্গে বঙ্গদেশ সরকার কর্তৃক এক বছর আগেকার পেশ করা একটি প্রস্তাব কার্যকর করার। প্রস্তাবটিকে তখন অমিতব্যয়ের অজুহাতে নাকচ করে দেয়া হয়েছিল। প্রস্তাবটিতে দেশীয় প্রেস ও প্রকাশিত বইপত্র সম্পর্কে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস-এর নির্দেশ কার্যকর করার নিমিত্ত এবং অন্যান্য ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য মাসিক ২৫০ টাকা বেতনে (প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় সহকারে) একজন বাংলা রিডার ও গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছিল।

৬. বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ের উন্নয়ন সাধনে বাংলা ছাপাখানাগুলির বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। যেমন: কৃষি-উদ্যান সমিতি (Agro-Horticultural Society) তাদের 'কৃষি দর্পণ' নামক পত্রিকার প্রথম খণ্ড বাবু পি. সি. মিত্রের [প্যারীচাঁদ মিত্র] সম্পাদনায় প্রকাশ করেছে। উদ্যানকর্মী ও অন্যান্যদের সহজ ভাষায় কৃষি ও উদ্যান বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি পরিবেশন করা এ পত্রিকার লক্ষ্য।[১০]

সরকারের শিক্ষা বিভাগ[১১] বিগত চার বছরে রেভ. ডব্লিউ স্মিথ ও বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "এডুকেশন গেজেট' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় এ পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ৫৫০। এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় শিক্ষকদের কর্মখালি বিজ্ঞাপন, শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ, সাধারণ সংবাদসমূহের চুম্বক এবং জনপ্রিয় বিজ্ঞান, জীবনী ও ইতিহাস-বিষয়ক নিবন্ধাদি। চিঠি-পত্র বিভাগে মফস্বলের অজস্র লেখক অংশ গ্রহণ করে।

সমাজসংস্কারের প্রবক্তাগণ গত চার বছর যাবৎ 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করছেন। পত্রিকাটিতে আটপৌরে মানুষের বোধগম্য সহজ ভাষায় হিন্দুদের সামাজিক কুসংস্কারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মনোরঞ্জন গল্পের সাহায্যে সংস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয়। বিধবা-বিবাহের সপক্ষে আইন প্রণীত হলেও হিন্দু জনসাধারণের অজ্ঞতার দরুণ তা প্রায় অচলপত্রে পরিণত হয়েছে। তাহলেও প্রশ্নটি প্রকাশ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে আলোচিত হওয়ার ফলে বাংলাভাষায় এ-সম্পর্কে পঁচিশটিরও বেশী পুস্তক রচিত হয়েছে।

মনু এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের কতিপয় সূত্রের ভাষাকে বিতর্কের প্রধান কেন্দ্র করে এ-সকল পুস্তকে উভয় পক্ষই দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন।[১২]

সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ-বিষয়ে তিনটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এই পুস্তকগুলি বহুল প্রচারিত হয়েছে এবং অন্ধ কুসংস্কারের অচলায়তন ভেঙে দিতে বিশেষ সহায়তা করেছে।[১৩] নাট্যগীতের দিকে হিন্দুদের যে রুচি দেখা যায় তাকেও বিধবাবিবাহ ত্বরান্বিত করার কাজে লাগানো হয়েছে। এ বিষয়ে অনেকগুলি সুরচিত নাটক প্রকাশিত হয়েছে। বিধবাদের কুমারীজীবন যাপনের ফলে সমাজে যে-সমস্ত দুর্নীতি দেখা দিচ্ছে শ্লেষাত্মক ও শাণিত ভাষায় এ-সব নাটকে তা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কোন কোনটি আবার রক্ষণশীল পুরাতন হিন্দু সম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও কলকাতা এবং হুগলী উভয় জায়গাতেই জনাকীর্ণ দর্শক মণ্ডলীর সম্মুখে দেশীয় অভিনেতাদের দ্বারা মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। সম্প্রতি মদ্যপান ও গাঁজা-সেবনের অপকারিতা প্রদর্শন করে একটি নাটক রচিত হয়েছে। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক বাবু পি. সি. মিত্র 'আলাল-দুলাল' নামক গ্রন্থে[১৪] ব্যাঙ্গাত্মক ও বলিষ্ঠ ভাষায় তার স্বদেশবাসীদের সামাজিক দোষ-ত্রুটিসমূহ তুলে ধরেছেন। তিনি এখন 'মদ খাওয়া' নামে আরও একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।[১৫] এই গ্রন্থেও পূর্বোক্ত গ্রন্থের মত গল্পাকারে মদ্যপান জনিত অপকারিতার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এই বাবুরই রচিত অপর একটি গ্রন্থ যন্ত্রস্থ আছে। তাতে তিনি গল্প, ইতিবৃত্ত, জীবনী প্রভৃতির আবরণে স্ত্রী-শিক্ষার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন। নীলকরদের অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিষয়ে যে-কেবল গীতই রচিত হয়েছে তা নয়, 'বাপ্‌রে বাপ্ নীলকরের কি অত্যাচার' নামে একটি পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত এবং মঞ্চে অভিনীত 'সপত্নী নাটক'-এ কৌলিন্য ও বর্ণপ্রথাকে আক্রমণ করা হয়েছে। নন্দকুমার কবিরত্ন প্রণীত 'বিবাদ ভাঙ্গার্ণব' এবং 'বৃক্ষতত্ত্ব চূড়ামণি' প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজসংস্কারের পক্ষে জোরাল বক্তব্য রাখা হয়েছে।

নানক, কবির প্রমুখ ভারতবর্ষীয় সমাজ-সংস্কারকদের মত বেদান্তবাদীরাও দেশীয় ভাষাকে কাজে লাগিয়েছে এবং গত ২০ বছর যাবৎ তাদের মাসিক মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সুদক্ষ সম্পাদনায় বেদ, নীতিতত্ত্ব, প্রাকৃতদর্শন ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত মূল্যবান প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করে আসছে। এ পত্রিকার মাসিক প্রচার সংখ্যা প্রায় ৮০০ কপি। বেদান্তবাদীদের অপর মুখপত্র 'হিতৈষিণী' পত্রিকার মত আরও বাংলা সামাজিক পত্রাদি বর্তমানে প্রচলিত আছে। তত্ত্ববোধিনী সমিতির সদস্যবৃন্দ নীতিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁদের লেখা প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছেন। তাঁরা স্বদেশী সুর আরোপিত প্রার্থনাসংগীত বাংলা ভাষায় এবং স্বদেশী সুরে করেন। তাঁদের প্রার্থনাসঙ্গীত বাংলায় রচিত এবং স্বদেশীসুর আরোপিত। তাদের ধর্মোপদেশও বাংলা ভাষাতেই রচিত।

৭. দেশীয় ছাপাখানার দ্রুত উন্নতিতে একথাই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে এখানে সেন্সরের মত একটি ব্যবস্থা আরোপ করার কোন আবশ্যকতাই নেই। এবার অতীতের দিকে নজর ফেরান থাক। ১৮২০ সালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহে ৩০টি বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছিল: ৫টি কৃষ্ণ-বিষয়ক, ২টি বিষ্ণু-সম্পর্কিত, ৪টি দুর্গা-বিষয়ক, ৩টি উপাখ্যান, ৫টি আদিরসাত্মক এবং একটি করে স্বপ্ন, সংগীত, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ এবং রামমোহনের অনুবাদ ও পঞ্জিকা-সমূহ (পরিশিষ্ট-'ঘ' দ্রষ্টব্য)। ১৮২২ থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ২৮টি গ্রন্থ। এদের মধ্যে তিনটিকে বাদ দিলে বাকী সব ক'টিই পৌরাণিক কাহিনী অথবা উপাখ্যান। এ ধারাতেই পুস্তক প্রকাশনার কাজ এগিয়ে চলে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত। তারপর ধারার মোড় পরিবর্তিত হয়ে নজর যায় প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশনার দিকে।

১৮৭২ সালে ৫০টি নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে আছে নয়জন প্রখ্যাত হিন্দু মহিলার জীবনী, ক্লাইভের জীবনী, রবিনসন ক্রুশো, ল্যাম্বস টেল্‌স্ ফ্রম শেক্‌স্‌পীয়ার, একটি ভারতবর্ষের ইতিহাস, একটি প্রাকৃতিক ইতিহাস' প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব, একটি পদ্যে রচিত ব্যাকরণ, গ্যালিলিওর জীবনী ও নীতিকাহিনী। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয় বাংলার ইতিহাস, আইজ্যাক নিউটনের জীবনী, কৃষি-বিজ্ঞান তত্ত্ব, শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস', আরব্যোপন্যাস, 'সত্য ইতিহাস' ও নীতিকাহিনী। ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে বর্ধমানের নীতিকাহিনী, নীতিপাঠ, ঈশপের পশু-পাখির গল্প, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ, ইংল্যান্ডের লোকপ্রিয় ইতিহাস, বিধবাবিবাহ-বিষয়ক নাটক, প্রাকৃতিক দর্শন, পার্শী ইতিবৃত্ত, পল ও ভার্জিনিয়া, লুথারের জীবনী, বাষ্পীয় এঞ্জিন এবং নীতি-তত্ত্ব।

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে: হ্যান্‌স্ এন্ডারসনের নীতিকাহিনী—হিন্দুদের রচনা থেকে নীতি-সংকলন—হিন্দুসমাজের বহুবিবাহ বিরোধী নাটক—স্মিথসের গ্রীসের ইতিহাস—ক্ষেত্রতত্ত্ব—পৃথিবীর ইতিহাস—মহানুভব পিটারের জীবনী—উইলিয়ম টেল-এর জীবনী—আলেকজান্ডারের জীবনী—তৈমুরের জীবনী—নৈতিক ও সাহিত্যিক সংকলন—মিশনারীদের বজরা—পরমাত্মার কথা, বার্থ প্রণীত গীর্জার ইতিহাস—সচিত্র সাময়িকী-নীতিমালা—আমেরিকা আবিষ্কার—হাতি ও উটের সচিত্র বিবরণ— বেদান্ত-বিষয়ক আলোচনা—নীতিকাহিনীর রূপকে নৈতিক উপদেশ —পুলিশ আইন—বিধবা বিবাহের পক্ষে নাটক—নীতিকাহিনী— বৈধব্যজীবনের অভিশাপ-বিষয়ক নাটক—আরব্যোপন্যাস —বিধবাবিবাহ বিষয়ক নাটক—পারস্যের প্রাচীন ইতিহাস—সতীত্বের সমর্থনে নাটক—সামাজিক গলদের বিষয়ে নাটক—সমাজ সংস্কার সাময়িকী—বস্তু ও গতির তত্ত্ব—রাসেলাস—চেম্বারের নীতি পাঠ —কৃষি বিচিত্রা—বস্তুপাঠ—প্রকৃতি বিজ্ঞান তত্ত্ব—কলকাতার পুরাতন দুর্গের ইতিবৃত্ত—প্রকৃতিক প্রত্নরত্ন সংক্রান্ত—ঐতিহাসিক গল্পমালা —আদি খ্রীস্টানদের উপর দশটি নির্যাতনের কাহিনী——নূরজাহানের গল্প—ভারতবর্ষের ইতিহাস—বিধবাবিবাহ সমর্থন— এলিজাবেথ বা সাইবেরিয়ার নির্বাসিতগণ।

১৮৫৭ সালে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতায় মুদ্রিত পুস্তকসমূহ বিষয়-অনুসারে নিম্নে বিন্যাস করা হল:

	পুস্তকের সংখ্যা	কপির সংখ্যা
পঞ্জিকা	১৯	১,৩৬,০০০
জীবনী ও ইতিহাস	১৫	২০,১৫০
খ্রীস্টান ধর্ম-সংক্রান্ত	৮	৯,৫৫০
নাট্যরচনা	৮	৫,২৫০
শিক্ষা-বিষয়ক	৪৬	১,৪৫,৩০০
আদি-রসাত্মক	১৩	১৪,২৫০
কথা-সাহিত্য	২৮	৩৩,০৫০
আইন	৫	৪,০০০
বিবিধ	১২	১৮,৩৭০

	পুস্তকের সংখ্যা	কপির সংখ্যা
পৌরানিক ও হিন্দুধর্ম-বিষয়ক	৮৫	৯৬,১৫০
নীতিকাহিনী ও নীতিকথা	১৯	৩৯,৭০০
মুসলমানী বাংলা	২৩	২৪,৬০০
প্রকৃতি বিজ্ঞান	৯	১২,২৫০
সংবাদপত্র	৬	২,৯৫০
সাময়িকপত্র	১২	৮,০০০
সংস্কৃত-বাংলা	১৪	১৫,০০০
	৩২২	৫,৭১,৬৭০

কলকাতাস্থিত ৪৬টি বাংলা ছাপাখানার একটি তালিকা ও তৎসহ এসব ছাপাখানা থেকে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাভাষায় মুদ্রিত পুস্তকের কপির সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

আলীপুর জেল	৭,০০০
এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন	১৯,১০০
অনুবাদ	৪,৮০০
ভাস্কর	৪,৩০০
বাঙ্গালা	৫,৫০০
বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা	৪০০
ব্যাপটিস্ট মিশন	৫৫,০০০
বেঙ্গল সুপিরিয়র	৫,০০০
বিশপ্‌স্ কলেজ	৭৫০
ভুবন মোহন	৩,০০০
বিশ্ব প্রকাশ	৫,২৫০
চৈতন্য চন্দ্রোদয়	৪৭,০০০
চন্দ্রিকা	২৫০
কোন্‌স্	১৪,০০০
হরিহর	২৪,০০০
হিন্দু প্যাট্রিয়ট	১,০০০
জ্ঞানোদয়	১৪,৭৫০
জ্ঞান রত্নাকর	৩,০০০
কবিতা রত্নাকর	২২,৮০০
কাদেরিয়া	২,০০০

কমলালয়	১৩,৮০০
কমলাসন	১৮,০০০
লক্ষ্মী বিলাস	১১,৭৫০
নিউ প্রেস	৭৫০
নিস্তারিনী	৬,৫০০
নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা	২,১০০
প্রভাকর	২,৫০০
পূর্ণচন্দ্রোদয়	৮,৪৫০
রহমানী	৫০০
রায়	৪,৩০০
রয়েল ফিনিক্স	২,৭০০
রোজারিও	৩,৩০০
সংস্কৃত	৮৪,২২০
সর্বার্থ প্রকাশিকা	৫০০
সত্যার্ণব	৩,৫৫০
শাস্ত্র প্রকাশ	২৩,০০০
স্ট্যানহোপ	৩,৫০০
সুচারু	৮,০০০
সুধাবর্ষণ	১,৩০০
সুধানিধি	২৭,৭০০
সুধার্ণব	১,২৫০
সুধাসিন্ধু	২৫,৩০০
সুদ্ধসিন্ধু, সিমলা	৮,০০০
তত্ত্ববোধিনী	১৯,৩০০
বিদ্যারত্ন, মির্জাপুর	১৪,৫০০
বিদ্যারত্ন, আহিরী টোলা	৩৮,০০০
বিক্রয়ের জন্যে মোট—	৫,৭১,৬৭০
বিনামূল্যে — হিন্দুদের দ্বারা	৭,৭৫০
বিনামূল্যে — খ্রীস্টানদের দ্বারা	৭৬,৯৫০
সর্বমোট—	৬,৫৬,৩৭০

১৮৫৭ সনের তালিকা ছাড়া অন্য কোথায়ও শিক্ষা সংক্রান্ত বইপত্রের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু নীচে প্রত্যেক বিষয়ে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা দেওয়া হল। এ সংখ্যার সঙ্গে প্রতিমাসেই কিছু কিছু নতুন পুস্তকের নাম যোগ হচ্ছে। বীজগণিত-১ ; গণিত-২ ;

অভিধান ও শব্দ কোষ—৬০ ; ইউক্লিড-১ ; ভূগোল ও মানচিত্র—৩৫ ; ব্যাকরণ—৩০ ; ইতিহাস ও জীবনী—৬০ ; ক্ষেত্রতত্ত্ব-২ ; প্রাকৃতিক ইতিহাস—২৫ ; প্রাকৃতিক দর্শন-২৩ ; বিদ্যার্থীদের প্রাথমিক জ্ঞানের পুস্তক—৪০ ; বিদ্যার্থীদের উচ্চতর জ্ঞানের পুস্তক—৩৫ ; বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা—২ ; অতীত ও বর্তমানের মধ্যে কত পার্থক্য ! এ হল বিগত ছয় বছরের ফলশ্রুতি। ভবিষ্যৎ অবশ্যই আশার আলোকে সমুজ্জ্বল।

৮. স্ত্রীশিক্ষার বিরাট প্রশ্নটি দেশীয় ছাপাখানার উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিন্দু মেয়েদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের স্বল্পকালীন মেয়াদ, তাদের গার্হস্থ্য দায়-দায়িত্ব এবং হিন্দু সমাজের অবস্থার কথা বিবেচনা করে গৃহ-শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা তাদের নিজেদের ভাষাতেই দিতে হবে। এর ফলে বিদ্যালয়ের জন্য এবং পারিবারিক পাঠাগার গঠনের নিমিত্ত বইপত্রের প্রচুর চাহিদা দেখা দেবে। বাঙালী মেয়েরা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, অনেকেই বর্তমানে তাদের স্বামী ও ভাইদের কাছে পড়তে শিখছে। ভার্নাকুলার লিটারেচর কমিটির কোন কোন বই, যেমন, 'এলিজাবেথ বা সাইবেরিয়ার নির্বাসিতগণ', 'পল ও ভার্জিনিয়া', 'হ্যান্‌স্ এন্ডারসনের গল্প, 'সুশীলার কাহিনী' ইত্যাদি বাঙালী মেয়েদের কাছে খুবই হৃদয়গ্রাহী প্রতিপন্ন হয়েছে। বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের প্রণীত প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তক-সমূহ মেয়েদের বিদ্যালয়ের জন্যে অত্যন্ত উপযোগী। মেয়েদের যদি সৎ গ্রন্থাদি সরবরাহ করা না হয় তাহলে তারা অবশ্যই নিকৃষ্ট ধরনের বই পড়বে। আমরা একটি ঘটনা জানি যেখানে এক উচ্চবংশীয়া মহিলা তাঁর ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীকে 'বিদ্যাসুন্দর' নামক আদি রসাত্মক বইটি সংগ্রহ করে দিতে বলেছিল। কিন্তু ঐ শিক্ষয়িত্রী তা না করে তার পরিবর্তে তাকে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'সুশীলা' বইটি পড়তে দেন। এর ফলে উক্ত পরিবারের বন্ধু মহলেও সেই বইটির ছয় কপি বিক্রি হয়েছিল।

৯. সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তনের এমন অনেক প্রবক্তা আছেন যাদের কাছে 'চোখের সামনে না থাকা' আর 'অস্তিত্বহীনতা' একই কথা। যেহেতু ভাল বাংলা বই এ-শ্রেণীর লোকদের নজরে খুব বেশী পড়ে না, সেহেতু তাদের ধারণা যে বাংলা বইয়ের সংখ্যাই কম। দেশীয় লোকেরা ইংরেজী স্কুলগুলিতে ভিড় করছে দেখে তারা সিদ্ধান্ত করেছেন যে বাংলা ভাষা ক্রমশঃ লয় পাচ্ছে। এ-জাতীয় লোকদের প্রতি আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, অতীতের দিকে তাকান ; গত শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করুন। মুসলমানেরা সরকারী অফিস ও আদালতগুলিতে ফারসী ছাড়া আর কোন ভাষার প্রবেশাধিকার দেয় নি।[২৬] অপরদিকে ব্রাহ্মণেরা এই অশিষ্ট ভাষাকে ঘৃণার চোখে দেখত এবং এ ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে তাদের কোন বিদ্যালয় ছিল না।[২৭] 'রামায়ণ', 'গঙ্গাভক্তি' ইত্যাদির মত খান কয়েক পৌরাণিক গ্রন্থই ছিল এ ভাষার যথাসর্বস্ব। গদ্যে রচিত কোন পুস্তকের অস্তিত্বই ছিল না। এ শতকের প্রারম্ভে অভিধান ও ব্যাকরণ গ্রন্থ ছিল মাত্র একটি করে। উভয়টিই ছিল ইউরোপীয়দের লেখা। এমনকি বছর চল্লিশেক আগে, কোলব্রুক, উইলসন প্রমুখ ব্যক্তিদের সময়েও ইউরোপীয় প্রাচ্য-বিদ্যা বিশারদগণ বাংলা ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছেন।[২৮] ১৯২৬ সালে মি. মার্শম্যান দেশীয় ছাপাখানাগুলি সম্পর্কে একটি সুলিখিত নিবন্ধে চার বছর সময়ের মধ্যে ৩১টি বাংলা পুস্তকের ৩০,০০০ কপি বিক্রয়ের নিমিত্ত মুদ্রিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট লোক-হিতৈষীদের সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। এমন কি ১৮৩৫ থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্তও, কাউন্সিল অব এডুকেশন, মিশনারী সম্প্রদায় এবং দেশীয় লোকেরা বাংলাভাষাকে দস্তরমত অবহেলা করেছেন। সরকারী ও মিশনারী বিদ্যালয়গুলির অধি-কাংশ ছাত্র এবং তাদের প্রশিক্ষকবর্গও বাংলাভাষার প্রতি তাচ্ছিল্যই দেখিয়েছেন। কিন্তু একদিন এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। দেশজ ভাষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল যাতে "সরকারী শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানসমূহের প্রভাব তাদের চতুর্দেয়ালের ভিতরেই সীমাবদ্ধ হয়ে না পড়ে"। মিশনারীরা

ক্রমেই উপলব্ধি করতে আরম্ভ করল যে বর্তমান রীতি অনুযায়ী ধর্মান্তরিত দেশীয় খ্রীস্টানদের ইংরেজীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে তারা নিজেদের ভাষাকেই ঘৃণা করতে শিখেছে এবং তারা এ ভাষায় লেখা ও ধর্মপ্রচার করা উভয় কাজেরই অযোগ্য হয়ে পড়ছে। এর ফলে তাদের নিজেদের পরিকল্পনাই পণ্ড হচ্ছে। তাছাড়া, জাতীয়-তার দিক থেকে মাতৃভাষার প্রতি এই অবজ্ঞা যে ক্ষতিকর সে কথাও এ দেশের অনেক শিক্ষিত লোক বুঝতে পেরেছেন। এ সব কার্যকারণের ফলে বাংলা বইপত্রের চাহিদা বেড়ে গেছে। এখন প্রতি বছর এই চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তেই আছে।[১৯] কলকাতায় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ছিল :

১৮৫৩ সালে	- - - -	৩,০৩,২৭৩
১৮৫৭ সালে	- - - -	৫,৭১,৬৭০

সিপাহীবিদ্রোহের বছরটিতে মানুষের মন স্বভাবতই ভবিষ্যতের কথা ভেবে আতঙ্কে বিচলিত হয়েছিল এবং তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ ছিল। কিন্তু এ সময়ে বাংলা-ভাষায় হিন্দুদের রাজানুগত্য-বিষয়ক একটি মাত্র গ্রন্থ (রাজভক্তি) এবং বাংলা সংবাদ-পত্রের নিবন্ধসমূহ ছাড়া এমন কোন দলিল রচিত হয় নাই যা বিদ্রোহের উপর ঐতি-হাসিক আলোকসম্পাত করবে কিংবা বিদ্রোহের প্রসঙ্গের কোন ইঙ্গিত দেবে। বাংলা-ভাষায় চিরকাল এরকম ধারাই চলে আসছে। এ দেশে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতে এখনও বাকী আছে। অদ্যাবধি বাংলাভাষায় একটি মাত্র ভ্রমণ কাহিনীও রচিত হয় নাই। ১৮৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত, এ দেশের অতীত বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থের সংখ্যা ছিল মাত্র দু'টি ; একটি হল আকবরের রাজত্বকালের সুন্দরবনের রাজা 'প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত' এবং অপরটি হল গত শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষক, নদীয়ার রাজা 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী'।[২০] অবশ্য শিক্ষা বিস্তারের ফলে বাংলা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থের চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বর্তমানে এ ভাষায় গ্রীসের ৩টি স্বতন্ত্র ইতিহাস, রোমের ৩টি স্বতন্ত্র ইতিহাস, ৩টি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, ১টি মিশরের, ৮টি ভারতবর্ষের, ৩টি বঙ্গদেশের, ২টি প্রাচীন ইতিকাহিনী, ১টি গীর্জার ইতিহাস, ১টি ইহুদীদের ইতিহাস এবং ১টি পাঞ্জাবের ইতিহাস আছে।

১১. পূর্বোক্ত বিবরণ অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কলকাতায় বিভিন্ন পুস্তকের ৫,৭১,৬৭০ কপি মুদ্রিত হয়েছিল। এ সংখ্যা মুদ্রিত পুস্তকের প্রকৃত সংখ্যা থেকে কম। বর্তমান প্রবন্ধকার এমন অনেক গ্রন্থ দেখেছেন যেগুলি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। ছাপাখানার কর্তৃপক্ষরাও তাদের মুদ্রিত পুস্তকের সঠিক হিসাব রাখে না। তাছাড়া অধিকতর কর ধার্য করা হবে আশঙ্কা করে তারা তাদের মুদ্রিত পুস্তকের যথার্থ তালিকা সরবরাহ করতেও নারাজ। ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রচার সংখ্যা অবগত হওয়াই যেখানে কঠিন ব্যাপার সেখানে দেশীয় সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা যে সহজসাধ্য নয় তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। তাই কম করে ধরলেও আমার হিসেবে বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬,০০,০০০ কপি। অবশ্য এ সংখ্যার মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বর্ধমানের রাজা, কালিপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের হিন্দু পৃষ্ঠপোষকদের দ্বারা মুদ্রিত ৭,৭৫০ কপি এবং কলকাতার বাইবেল ও ট্রাস্ট সোসাইটি কর্তৃক বিতরিত ৭৬,৯৫০টি ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা ধরা হয় নাই। খুবই আনন্দের বিষয় হচ্ছে যে বাইবেল ও ট্রাস্ট সোসাইটিগুলি বস্তুতঃ এ-সত্য স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে যে ধর্মীয় পুস্তিকাদি বিনামূল্যে বিতরণের ফলে কাগজ ব্যবসায়ী ও মুদ্রাকরদের যতই উপকার হোক না কেন, জনমনে এই বইগুলির মূল্য সম্পর্কে কিন্তু কোন উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় না। বরঞ্চ এর দ্বারা দেশীয় লোকদের রুচির বিরোধী এক শ্রেণীর পুস্তক প্রকাশনায় উৎসাহই যোগান হয়।

১২. কলকাতার ছাপাখানাগুলিতে মুদ্রিত উর্দু ও ফারসী ভাষায় পুস্তকাদির কোন বিবরণ আমি প্রস্তুত করি নাই, কেননা ঐ দু'টি ভাষা আমার জানা নাই। বিশেষতঃ নিছক বিশ্বাসের উপর মুসলমানদের কাছ থেকে মুদ্রণের হিসাব ও বিবরণ নিতে আমি নারাজ। আমি আরও দেখেছি যে তারা আমাকে তথ্য সরবরাহ করতে অনিচ্ছুক। তবে এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে বিদেশীয়রা মুসলমানদের সম্বন্ধে যাই ভাবুক, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাদের মন অনেক বেশী সচেতন ও সক্রিয়। ছয় বছর আগে আমি দিল্লী, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম সেখানকার উর্দু ও ফারসী ছাপাখানাগুলি দেখতে। ঐ সব জায়গায় যে বিপুল পরিমাণ ছাপার কাজ চলছিল তা দেখে আমি দস্তুর মত অবাক হয়ে গিয়েছি। সন্দেহ নেই যে, এখানে কলকাতায়, ঠিক সে সে-রকম ব্যাপারই ঘটছে। কিন্তু এ বিষয়ে আগ্রহী কিংবা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করার যোগ্যতা-সম্পন্ন ইউরোপীয় এখানে খুব কমই আছেন।[২১] শ্রীরামপুর, ঢাকা এবং বর্ধমানেও ছাপাখানা আছে।

১৩. কাগজ এবং মুদ্রণ-শৈলীর ক্ষেত্রেও বিগত দশ বছরে বিলক্ষণ উন্নতি সাধিত হয়েছে। অধিকাংশ বাংলা পুস্তক এখন মুদ্রিত হচ্ছে উৎকৃষ্ট কাগজে ও সুস্পষ্ট হরফে। আগেকার দিনের সঙ্গে এখন কত পার্থক্য। মাত্র বিশ বছর আগেও, একটি দেশীয় ছাপাখানার বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল এ ভাবে: "মনে হয় কাঠের মুদ্রাযন্ত্রটি প্রত্যেকবার ছাপ দেওয়ার পরই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে। যে সব অক্ষর দিয়ে জোর করে কাজ চালানো হচ্ছে সেগুলি অনেক আগেই ঢালাই কারখানায় ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কাগজগুলি ভাতের মাড়ের কল্যাণে কোন রকমে জড়াজড়ি করে আছে এই যা। কারিগরগুলিও মোটেই কাজের নয়, তারা এক টাকার বিনিময়ে চারটি বড় আট পৃষ্ঠার শিট কম্পোজ করে মেশিনে উঠায়।" কিন্তু এখন ইউরোপীয় ছাপাখানার মতই দেশীয় ছাপাখানা থেকে চমৎকার কাজ পাওয়া যাচ্ছে। কাঠের মুদ্রাযন্ত্র এখন কৌতূহল মিটানোর জিনিস। লক্ষণীয় যে আগ্রা প্রেসিডেন্সিতে প্রায় সব ক'টি ছাপাখানাই লিথোগ্রাফিক, পক্ষান্তরে কলকাতায় সেগুলির সংখ্যা খুবই কম।

১৪. দেশীয় লেখকেরা যখন সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত আকারে নতুন বাংলা গ্রন্থাদি প্রকাশ করে তখন সাধারণতঃ তারা সেগুলির মূল্য বেশী রাখে। কারণ বই লেখা যে বেশ লাভজনক তা তাদের অনেকেই বুঝতে পেরেছেন এবং কোন কোন লেখক এখন বই লিখে নিয়মিত উপার্জনও করছেন। এটা খুবই সুলক্ষণ, কেননা এখানে মেহনতের উপযুক্ত পারিশ্রমিক রয়েছে। অবশ্য চেম্বার্স, ক্যাসেল ও অন্যান্য প্রকাশনীরা জানে যে স্বল্প মুনাফায় টাকা দ্রুত খাটানোর পন্থাই হয় পরিণামে সবচেয়ে লাভজনক। জনসাধারণের জন্য মুদ্রিত স্বত্ববিহীন বইপত্রই সস্তা; গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত বইগুলি সে-রকম নয়। আমাদের সামনে রয়েছে একটি বাংলা পঞ্জিকা। এটি উত্তম কাগজের ৩০২ পৃষ্ঠা সম্বলিত এবং এক আনায় ৬০ পৃষ্ঠা হিসেবে মুদ্রিত। পক্ষান্তরে এর চেয়ে খারাপ কাগজে মুদ্রিত ৮০ পৃষ্ঠার পঞ্জিকাও এক আনা মূল্যে বাজারে বিক্রয় হচ্ছে। প্রতি বছর বিক্রয় হচ্ছে ছয় হাজার কপি। ৬০ পৃষ্ঠার শিশুবোধ (বাংলার Lindlay Murray) বিক্রয় হয় এক আনা মূল্যে। ফি বছর এর ৭/৮টি সংস্করণ বের হয়। বিদ্যাসুন্দর নামক ৬১ পৃষ্ঠার একটি লোক প্রিয় গল্পগ্রন্থও বিক্রয় হয় এক আনা মূল্যে। ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটিও তাদের কোন কোন ৬০ পৃষ্ঠার বই প্রতি সংস্করণে ২০০০ কপি হিসেবে ছেপে মূল্য স্থির করেছে এক আনা করে।[২২] শিক্ষা বিভাগ পল্লীর বিদ্যালয়গুলির জন্যে স্বল্পমূল্যে বই প্রকাশ করার কোন ব্যবস্থাই এখন পর্যন্ত করে নাই। অথচ সুলভে বিক্রয়ের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বইপত্র দেশীয় বিদ্যালয়গুলির কোন উপকারেই আসবে না।[২৩]

১৫. আমরা জানি যে বঙ্গদেশে পল্লীর জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ লোক ভালভাবে পড়তে সক্ষম। অর্থাৎ এ দেশে ২,৯০,০০,০০০-এরও বেশী লোক জ্ঞান আহরণের জন্যে বই পড়তে অক্ষম। তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে, এক বছরেই ৬,০০,০০০ কপি বই এদেশে বিক্রির জন্য ছাপা হয়েছিল। এমতাবস্থায় শিক্ষার মাধ্যমগুলিকে যখন মানসিক জড়তাগ্রস্থ জনসাধারণের সেবায় ব্যাপকভাবে লাগানো হবে তখন দেশীয় ছাপাখানাগুলিতে অনিবার্যভাবেই এক বিরাট কর্মতৎপরতা দেখা দেবে। এই অনুপাতে যদি জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা যায় তাহলে প্রতি বছর ৫০,০০,০০০ কপি বই প্রকাশিত হবে। কারণ, বাঙালী চাষীর মনে একবার শিক্ষার প্রতি কৌতূহল জাগাতে পারলে সে জ্ঞানের জন্য অধীর হয়ে উঠবে। দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা যখন এমনই অবহেলিত (নারী শিক্ষার কথা বাদই দেওয়া যাক, কেননা তা এখনও বিদ্যালয়ের বালকদের রচনা ও বক্তৃতার বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে) তখনও যদি বাংলা ছাপাখানাগুলির এত দূর অগ্রগতি হয়ে থাকে তাহলে বিশ বছর পরে অবস্থা কি দাঁড়াবে? প্রজাবৃন্দের সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে মানসিক জাগরণের ব্যবস্থা যুক্ত থাকা দরকার যাতে শিক্ষার দ্রুত-সঞ্চারী প্রভাবে তাদের মধ্যে জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার প্রতিরোধ করার মত পুরুষোচিত ভাব জাগে। বঙ্গদেশের ৫০,০০০ গুরু মহাশয় বা পল্লী-শিক্ষককে যদি একবার সক্রিয় করে তোলা যায় তাহলে তা ছাপাখানাগুলিতে কি অফুরন্ত আবেগই না সৃষ্টি করবে।

১৬. ইউরোপীয়দের দোকানে বাংলা বই বিক্রয় করা হয় না। কলিকাতার বাঙালীরা কোন বাংলা বই ছাপে কিনা তা' একজন ইউরোপীয়ের পক্ষে বিশ বছর এই শহরে বাস করার পরও জানা সহজ নয়। এ সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে হলে তাকে যেতে হবে বাঙালী পাড়ায় এবং বাঙালীদের পেটার নস্টার রো অর্থাৎ চিৎপুর রোডে। দেশীয় লোকেরা সাধারণতঃ যে-সব গলিতে বাস করে সেগুলির বাহ্য দৃশ্য মোটেই লোভনীয় নয়। তাহলেও তারা বেশ জমজমাট ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। অধুনা বহু শিক্ষিত বাঙালী বইয়ের দোকান খুলেছে। আমি এক ব্যক্তির কথা জানি যিনি বইয়ের ব্যবসা করে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা উপার্জন করেন। তবে ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে বই বিক্রয় করাই এখানকার প্রচলিত রীতি। শহর কলিকাতার ছাপাখানাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেরীওয়ালার সংখ্যা দু'শয়েরও বেশী হবে।[২৪] এদের দেখা যাবে মাথায় বইয়ের পাহাড় নিয়ে কলিকাতার বাঙালী মহলে কিংবা আশপাশের শহরগুলিতে বই ফেরী করতে। পাইকারী দরে বই কিনে এরা দূরবর্তী এলাকায় দ্বিগুণ দামে বিক্রয় করে মাসে ৬ থেকে ৮ টাকা রোজগার করে। অবশ্য এমন লোকের কথাও আমি জানি যে এ-ভাবে প্রতিমাসে একশ' টাকারও বেশী উপার্জন করে। বই ফেরী করার পদ্ধতিটি ইউরোপীয়দের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয়। এ দেশের লোকেরা তাদের বই-পত্রের প্রচারের জন্য এমন এক জীবন্ত এজেন্ট উদ্ভাবন করেছে যে বইপত্রগুলিই সামনে নিয়ে হাজির করে। ফেরীওয়ালাদের সাহায্য নেয়া হয়নি, শুধু এ কারণেই বাংলা ভাষায় মুদ্রিত অনেক ভাল ভাল বই বিক্রেতার দোকানের তাকে পোকায় কাটছে।[২৫]

১৭. প্রাচ্যদেশের একটি প্রচলিত রীতি হল তারা পুথি পাঠ করে শোনায় এবং পাঠে অক্ষম ব্যক্তিরা পাঠে সক্ষম ব্যক্তিদের সেই পাঠ শ্রবণ করে। অনেক সময় বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ পাঠ কিংবা সুর সহকারে আবৃত্তি করার জন্যে পারিশ্রমিক দিয়ে কথক (পাঠক) নিয়োগ করা হয়। কোন কোন কথকের আবৃত্তি খুবই হৃদয়গ্রাহী। এদেরই একজন সেদিন আমার আজ্ঞা অনুযায়ী রামায়ণ, রঘুবংশ, মহাভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে অবিমিশ্র স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে আমাকে শুনিয়েছেন। আবৃত্তির ধরনটি অবশ্য তেমন মনোজ্ঞ ছিল না।

কোন কোন কথক মাসে ৫০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জন করে। আজকের দিনেও কেউ কেউ মাসে ২০০০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করছে বলে জানা যায়। একজন বাবুর কথা শুনেছি, তিনি তার বাড়ীর ৪০/৫০ জন স্ত্রীলোককে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে আবৃত্তি শোনাবার জন্য বছরের পর বছর একজন কথক নিযুক্ত রেখেছিলেন। প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মত বঙ্গদেশেও স্মরণাতীতকাল থেকে কথকতা অত্যন্ত জনপ্রিয় রীতি হিসেবে প্রচলিত আছে। সুর, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি সহকারে পাঠ করলে শ্রোতৃমণ্ডলী তা' নির্জলা পাঠের চেয়ে অনেক বেশী মুগ্ধ হয়ে শোনে। কথকের চতুর্দিকে স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ বৃত্তাকারে উপবেশন করে। এখন, প্রতিটি পুস্তকের যদি দশজন শ্রোতা বা পাঠক থাকে তাহলে হিসেব করে দেখা যায় যে ৬,০০,০০০ বাংলা পুস্তকের জন্য ২০,০০,০০০ শ্রোতা বা পাঠক রয়েছে। এ সব ছাড়াও, ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাংলা পাঠকের সংখ্যাও বেশ বেড়ে যাচ্ছে। ইংরেজী স্কুলগুলিতে যারা অধ্যয়ন করে তাদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৯ জন স্বচ্ছন্দে এবং অভিধান দেখার পরিশ্রম ব্যতীত বুঝে ইংরেজী পড়তে অক্ষম। মফস্বলের প্রতি ২০ জনের মধ্যে ১৯ জনের সেই একই অবস্থা। কিন্তু ইংরেজী স্কুলে পড়ার ফলে তাদের চিত্তের যে জাগরণ ঘটে তাতেই তারা নিজেদের মাতৃভাষার বইপত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তারা ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করতে আসে জ্ঞানলাভের জন্যে নয়, আসে জীবিকা উপার্জনের পাথেয় কড়ি উপার্জনের আশায়। তাই তাদের অধিকাংশেরই ইংরেজী বিদ্যা বিস্মৃত হতে দেরী হয় না। কিন্তু মাতৃভাষায় পড়াশোনা তাদের কাছে তখন অধিকতর আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

১৮. বাঙালী মানসকে যে শতাব্দীর জড়তা থেকে জাগানো হয়েছে তা বাঙালী গ্রন্থ-কারদের সংখ্যা-স্ফীতি থেকেই পরিস্কার বুঝা যায়। আমি বাঙালী লেখকদের যে তালিকা তৈরী করেছি তাতে দেখা যায় যে তাদের সংখ্যা এখন সাতশ'য়েরও অধিক। বর্তমানে মাতৃভাষায় লেখার প্রবল আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। চাহিদার অনুপাতেই সরবরাহ বেড়ে থাকে। পাঠকের সংখ্যা বাড়লে লেখকদের সংখ্যা আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এই যে গ্রন্থ-স্বত্বের বিষয়টি এখানে সহজ স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। লোকে এখন প্রায়ই গ্রন্থ-স্বত্ব আইনের আশ্রয় নিচ্ছে। কেউ কেউ গ্রন্থ-স্বত্ব বিক্রয় করতে রাজী হচ্ছে না; আবার কেউবা চড়া দামে গ্রন্থ-স্বত্ব বিক্রয় করে দিচ্ছে।

তিন শ' বছর আগে হিন্দুদের বৈষ্ণব-সংস্কার আন্দোলন বাংলাদেশে অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বৌদ্ধরা যে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লৌকিক ভাষাকে হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করেছিল, এ-ঘটনা আমাদের বিশেষভাবে সে-কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেননা, দেখা যায় যে বাংলা ভাষায় প্রাচীন লেখকেরা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং তিনশ' বছর আগে তারা চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে-ছিল। বৈষ্ণবদের বই-পত্র সাধারণতঃ দেশীয় ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকে লিখতে এবং পড়তে জানে।[২৬] উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সেখানকার পাঁচ ভাগ হিন্দী পাণ্ডুলিপির মধ্যে চার ভাগই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। পক্ষান্তরে, বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই শৈব-সাহিত্যের পরিমাণ খুব কম।[২৭] বাংলা ভাষার লেখকেরা প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ণসম্ভূত। অবশ্য একালের বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অন্যতম পণ্ডিত রাজা রাধাকান্ত দেব একজন শূদ্র।[২৮] লক্ষণীয় যে তামিলসাহিত্য বাংলা-সাহিত্যের চেয়ে কয়েক শতাব্দীর প্রাচীন হলেও তার প্রধান লেখকবৃন্দ হলেন শূদ্র শ্রেণীভুক্ত এবং এদের পুরোবর্তী একজন হচ্ছেন মহিলা, নাম আম্বিয়ার।

মিশনারী এ্যাংলো-ভার্নাকুলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই উঁচুমানের শিক্ষা-দান করলেও পঁচিশ বছর পর এগুলি বাংলা লেখকদের সংখ্যার দিক থেকে নিতান্তই

বন্ধ্যা হয়ে পড়েছে। তবে বর্তমানে কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং এ-সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষার মাধ্যমে অধিক হারে শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

সংস্কৃত ও ইংরেজী জানা লেখকেরাই বাংলায় সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী। তবে দেশীয় লেখকদের মধ্যে যারা ইংরেজী রীতিকেই অনুকরণ করছেন তাদের লেখা দেশবাসীর কাছে বোধগম্য এবং গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। ইংরেজী ভাব খুবই উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই কিন্তু তার একটি প্রাচ্য দেশীয় পোষাক থাকা দরকার; ইংরেজী ভাবের কংকালের গায়ে দেশীয় রক্ত-মাংস আরোপ করা প্রয়োজন।[২৯]

পূর্ব-ভারতীয়েরা যদিও এ-দেশেরই মাটির সন্তান এবং তাদের পক্ষে স্থানীয় ভাষা ভালভাবে রপ্ত করার সুযোগ-সুবিধা বেশী, তা সত্ত্বেও বাংলায় তাদের কোন অবদান নাই বললেই চলে। রাশিয়ানদের 'মিলটন' পুশকিন যে সঙ্কর নিগ্রো তাতে তারা গৌরবই বোধ করে। কিন্তু এখানে তেমন কোন পূর্ব-ভারতীয় কিংবা পর্তুগীজ দেখা যায় নাই যিনি ভাল বাংলা লিখেছেন।

১৯. বর্তমানে বাংলা রচনা-শৈলীতে সরলতার সঙ্গে সৌন্দর্যের সংমিশ্রণ ঘটাবার এবং সংস্কৃতকে সবচেয়ে উত্তম ও উপযোগী আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেও বাংলার জনসাধারণের উপযোগী করে লেখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ইংরেজীর মতই, বাংলা ভাষায়ও, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জনসনীয়-শৈলী থেকে 'নরনারী'র অনুপম সরলতা পর্যন্ত বিচিত্র রচনারীতি বিদ্যমান। মাসিক পত্রিকার[৩০] সম্পাদক কথ্যভাষার রীতি গ্রহণ করেছেন। স্ত্রীলোক এবং বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞদের জন্য এ অতি উত্তম রীতি। কিন্তু এ রীতি প্রচলিত বইপত্রের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়—কারণ এ দেশীয় লোকদের মতে পুস্তকের ভাষা বাজারের ভাষার মত ন্যাড়া হলে চলে না, তাতে সৌন্দর্য থাকা প্রয়োজন। এই শেষোক্ত গুণ এর ভাষায় নাই, তবু সম্পাদক রাধানাথ শিকদার পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সোৎসাহে প্রচুর সময় ব্যয় করেছিলেন। একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ফারসী ভাষা বাংলার মুসলমানেরা বিগত পাঁচশ' বছর যাবৎ ব্যবহার করলেও আইনের গ্রন্থাদি ব্যতীত, অন্য কোথায়ও এর কোন প্রভাব পড়ে নাই। আইনের গ্রন্থাদি ছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য ৫৭ বছর আগে রামরাম বসুর লেখা 'প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত' পুস্তকটি ফারসী শব্দের অতিমাত্রিক প্রয়োগে একালের বাঙালীর কাছে প্রায় দুর্বোধ্য। একালের বাঙালী যুবকেরা বাক্যালাপে প্রচুর ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে। কিন্তু বই লেখার সময় তারা তা করে না।

২০. রাশিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রথম পর্যায়ে ছিল অনুবাদ ও বিদেশী আদর্শের (মডেল) অনুকরণ—এ পর্যায়টি অপরিহার্য ছিল এ-কারণে যে, কোন কিছু গঠন করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন নতুন ভাব, নতুন আদর্শ। পরবর্তী পর্যায়ে দেখা গিয়েছে স্বাধীন অনুবাদ ও অনুসৃত রচনা। সর্বশেষে এসেছে মৌলিক রচনা। বাংলা ভাষার বিগত শতাব্দী কেটেছে প্রধানত সংস্কৃত থেকে অনুবাদের কাজে। ফারসী থেকে অনুবাদ করা হয় নি। মুসলমানদের আইন-কানুন প্রণয়ন সত্ত্বেও বই-পত্রের ভাষায় ফারসীর প্রভাব পড়েছে সামান্য। বর্তমান অর্ধ শতাব্দী যাবৎ অনুবাদের কাজ চলছে প্রধানত ইংরেজী থেকে। তা সত্ত্বেও, এ-যাবৎ মৌলিক রচনা তেমন কিছু দেখা যায় নি। সাময়িক ও সংবাদপত্রগুলি এর ব্যতিক্রম—তাদের পৃষ্ঠায় গদ্য ও পদ্যে প্রচুর পরিমাণে মৌলিক সৃষ্টি স্থান পেয়েছে। পদ্য রচনার ক্ষেত্রে সংবাদ প্রভাকরের প্রাক্তন সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সৌন্দর্য ও মৌলিকতার জন্য উচ্চ-স্থান অধিকার করে আছে। আগে সংস্কৃত থেকে বিচিত্র বিষয়ে অনুবাদ করা

হত। এখন করা হচ্ছে ইংরেজী থেকে। সংস্কৃত কলেজ গোষ্ঠী অনুবাদের পক্ষে অনুপযোগী অনুচ্ছেদসমূহ বাদ দিয়ে এবং ইংরেজী রীতির প্রতি অন্ধ আনুগত্য বর্জন করে, স্বচ্ছন্দ স্বাধীন অনুবাদের নীতি গ্রহণ করেছে। এদিক থেকে রাসেলাস ও টেলিমোকাস-এর অনুবাদ হচ্ছে আদর্শস্থানীয়। মৌলিক গল্প রচনায় টেকচাঁদ ওরফে পি. সি. মিত্র এবং নারীশিক্ষা-বিষয়ক রচনায় মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বিশেষ সাফল্য লাভ করেছেন।

কলকাতার ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি মৌলিক রচনায় উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক ইতিহাস ও বিজ্ঞান, আঞ্চলিক বিবরণ ও ভূগোল, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক অর্থনীতি, সহজ ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, শিক্ষা, জীবন-চরিত ও নীতি-কাহিনীর বিষয়ে সোসাইটি কর্তৃক অনুমোদিত অন্যূন ১০০ পৃষ্ঠার মুদ্রিত মৌলিক রচনার জন্য ২০০ টাকা করে পুরস্কার ঘোষণা করেন। পুরস্কারের জন্য ১০টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে মাত্র দুইটি পুরস্কার লাভ করে। এ দুটি হল, এ দেশীয় মেয়েদের পক্ষে দূষণীয় এবং করণীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে রচিত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলা উপাখ্যান' এবং রাজ-পুতনার কাহিনী নিয়ে পদ্যে রচিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। উভয় রচনাই প্রশংসার যোগ্য এবং আদর্শ স্থানীয়।

উপরোক্ত পুরস্কারের পরিকল্পনা এখনও বিশেষ সফলতা লাভ করে নি। এর কারণ, একদিকে ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের মধ্যে খুব অল্প বাঙালীই বাংলা ভাষার বাক্-রীতি ঠিক রেখে বলিষ্ঠ ভাবে লিখতে সক্ষম। অপরদিকে, ইংরেজীতে যারা অনুভিজ্ঞ তাদের ভাবের ঘরে অভাব রয়েছে প্রচুর। এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে এমন সব মৌলিক লেখকের, যারা বিচিত্র তথ্যের যোগান দেওয়ার জন্য বাংলা ভাষার বাগ্-ধারা ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের ইংরেজী ভাষা জ্ঞান যোগ করবেন এবং বাংলাভাষাকে মসৃণ ও প্রাচ্যের অফুরন্ত কল্প-চিত্র দ্বারা সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এ-ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সংযোগ ঘটাবেন।

২১. ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে দু'টি জিনিসের অভাব লক্ষ্য করা যায়— এ-দেশের পাঠকদের কাছে ইংরেজীর দুর্বোধ্য দৃষ্টান্তসমূহ বাদ দেয়া এবং ইংরেজীর ওক গাছ, ডেইজী ফুল প্রভৃতি দৃষ্টান্তের পরিবর্তে বাঙলার কাব্যসম্ভার থেকে সুপরিচিত দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা। এ-দিক থেকে, প্রাচ্যের রূপ-কল্প, প্রতীক ইত্যাদির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য ইংরেজী জানা দেশীয় লোকদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান বিশেষ সহায়তা করবে। সংস্কৃতের এই ভাণ্ডার যে কত সমৃদ্ধ তা সাউদে, মিলম্যান (নল-দময়ন্তী), গ্রিফিথ প্রমুখের সংস্কৃত থেকে অনূদিত পুস্তকসমূহের দিকে তাকালেই বুঝা যায়। এ-দেশীয় রূপ-কল্প ইত্যাদিতে সংস্কৃত-ভাষা পূর্ব থেকেই সমৃদ্ধ করে সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করা যেমন সহজসাধ্য তেমনি সেগুলি বোধগম্য। এ-জন্যেই এ-ভাষার সাহায্যে অনূদিত বাইবেল প্রাচ্যের অধিবাসীদের অনুভূতির কাছে এত আপন হয়ে ওঠে।[৩১] দৃষ্টান্তের জন্যে বাংলা ভাষার অফুরন্ত ও বিচিত্র প্রবাদ-প্রবচনের ভাণ্ডার আছে। এই প্রবন্ধকারের কাছেও ১,২০০ প্রবাদ-প্রবচনের একটি সংগ্রহ আছে। এ-বিষয়ে নীলরতন হালদারের একটি পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে ১৮২৬ সালে। এই একই লেখকের 'বহুদর্শন' নামে ইংরেজী, ল্যাটিন, বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী প্রবাদ-প্রবচনের একটি সংকলন মুদ্রিত হয়েছে ১৮৩০ সালে। বাংলা ও ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছে প্রচলিত প্রবাদ-সমূহের অপর একটি সংকলন 'কবিতা রত্নাকর' নামে। এদিক থেকে ইংরেজী অনুবাদ সম্বলিত মর্টনের ৮০৩টি বাংলা ও ৭০টি সংস্কৃত প্রবাদের সংকলন একটি মূল্যবান গ্রন্থ। সাম্প্রতিক কালে, ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত ২৪৮টি নীতি-কণিকা 'নীতি-রত্ন' নামে।

তথ্যনির্দেশ

১ 'Returns retating to publications in the Bengali Language, in 1857'.

২ 'Report on the native Press in Bengali'.

৩ 'Report on the Native Press of Bengal', *Selections from the Records of the Bengal Government, No. XXXII*, pp. I-IXIII, Calcutta, 1859

৪ বাংলা ছাপাখানা এখন সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে লিপ্ত আছে। কয়েক বছর আগে রামমোহন রায় সতীদাহের বিরুদ্ধে এই ছাপাখানাগুলিকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে কোন কোন মহলে যে কুসংস্কার রয়েছে এ আন্দোলনের মাধ্যমে তা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

৫ 'Report of a Committee appointed by the Lieutenant-Governor of the North-Western Provinces for examining and reporting upon all works, known to have been compiled in these Provinces for the communications of European knowledge and Science, through the medium of the Persian and Vernacular'.

৬ E. Hall : 'Contribution towards an index to the Bibliography of the Indian Philosophical system.'

৭ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

৮ 'বিদেশীয়রা যে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের পরিসংখ্যানকে তাদের দৃষ্টিপাতের অযোগ্য বলে মনে করে না, নিম্নোক্ত গ্রন্থাদির প্রকাশ থেকেই তা বুঝা যায় : Histories de Hindustani Literature, 2 Vols. by Garcin de Tassey, প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপক, ১৮৩৯, এ পুস্তকে দ্বাদশ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৭৫০ জন উর্দু লেখকের ও ৯০০ উর্দু পুস্তকের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

Essai Critique sur la Literature Indienne et les Etudes Sanskrit, ১২২ পৃষ্ঠা, গ্রেনোবেল লাইসিয়ামের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক Monsieur soupe প্রণীত, ১৮৫৬। Histoire de la Literature Indienne, ৪৯৫ পৃষ্ঠা, Traduit dl'allemand, ভার্সিলিজ লাইসিয়ামের অধ্যাপক A. Sadous প্রণীত, ১৮৫৯। Academische Vorlesungen uber Indisch Literature Gaschichte par M. Weber, বার্লিন, ১৮৫৭

উর্দু সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ লিখেছেন De Tassy নামক জনৈক ফরাসী, সংস্কৃত সাহিত্যের বিবরণ লিখেছেন Weber নামক জনৈক জার্মান এবং পুশতু সাহিত্যের বিবরণ লিখেছেন জনৈক রাশিয়ান। মহারাষ্ট্রীয় পাণ্ডুলিপির সবচেয়ে ভাল সংগ্রহ আছে প্যারিসে। এগুলি ফরাসী পণ্ডিতদের, একটি প্রতিনিধি দল কর্তৃক পশ্চিম ভারত থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। রুশ সরকার পারস্যের সঙ্গে তাদের একটি চুক্তির অন্যতম শর্ত হিসেবে কয়েকটি বিশেষ ফারসী পাণ্ডুলিপি আদায় করেছিলেন।

৯ আমরা এ সত্য অবগত আছি যে 'এডুকেশন গেজেট' বিদ্রোহের সময় কর্তৃপক্ষের সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে যাতে মিথ্যা ধারণা ছড়িয়ে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে বিদ্রোহের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত রেখেছিল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে মফস্বলে কত অদ্ভুত সংবাদই না ছড়িয়ে পড়ে।

১০ ৩৬টি বিভিন্ন বিষয়ের রচনা এই সাময়িকীতে স্থান পেয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয় ছাড়াও এ-পত্রিকায় গোলআলু, ফুলকপি, শতমূলী, টিক, তরমুজ, আখ, কুসুম, পীচ, শাক-সবজী, সিলেরী শাক, শনপাট, আসামের আঁশ, তুঁত, কুইনাইন প্রভৃতির চাষ সম্বন্ধে নিবন্ধ ছিল।

১১ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সরকারী শিক্ষা বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত একটি হিন্দী ও উর্দু পত্রিকা অনুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে।

১২ এ সমস্ত পুস্তকের মধ্যে আছে 'পৌর্নভব' খণ্ড নং ৫৭ পৃষ্ঠা, বা বিধবা বিবাহের স্বপক্ষের যুক্তি খণ্ডন, কালিদাস মিত্র প্রণীত ;—'বিধবা বিবাহ বারণ', বিধবা বিবাহের বিপক্ষে এরাদার রামতর্কালঙ্কার প্রণীত ;—'বিধবা বিবাহ নাটক' ;—'বিধবা উদ্বাহ': 'বিধবা মনোরঞ্জন'—'বিধবা নিষেধ',-'পূর্ণ সুখের ক্ষীণভাগ' ; 'বিধবা বিবাহ' কমল কৃষ্ণ রচিত ;—অন্যপূর্বোদ্বাহ দৈত্য নির্দয় ' ; 'সপত্নী নাটক' অংশত কুলীন প্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণ ;—'বিধবা বিবাহ বধ', ধর্ম মর্ম প্রকাশিকা সভার সভাপতি দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রণীত;—'বৈধব্য ধর্মোদয়', ৭০ পৃষ্ঠা, নন্দকুমার কবিরত্ন প্রণীত ;-'বিধবোদ্বাহ নব্যোয়ক প্রশ্নাবলী,' এ বিষয়ে ৬টি প্রশ্ন ও উত্তর, পুলটিয়ার শ্যামনাথ রায় প্রণীত ;— 'বিধবা বিবাহ অনুচিত', পরাশরের টীকার ব্যাখ্যা, কৃষ্ণকিশোর রচিত ;—'বিধবা বিবাহ অনুচিত', প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'বিধবা বিবাহ নিষেধ প্রমাণাবলী', কাশিপুরের শক্রজিৎ [?] তর্করত্ন প্রণীত এবং ঠাকুরদাস শর্মা প্রণীত 'বিধবা বিবাহ ভ্রমাত্মক'।

১৩ তাঁর তিনখণ্ডে রচিত "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হয় কি না হয়" [বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, ১৮৫০] গ্রন্থে তিনি শাস্ত্রের বিশদ আলোচনা করে বিধবা বিবাহ যে প্রাচীন হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ ছিলনা তা দেখিয়ে দিয়েছেন। অগুরপাড়ার 'মহেশচন্দ্র চূড়ামনি' এবং ভাটপাড়ার রামদয়াল তর্করত্নও এই বিতর্কে লিপ্ত ছিলেন।

১৪ প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল', ১৮৫৮

১৫ প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়', ১৮৫৯

১৬ 'কোয়ার্টারলী ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১৮২৬, পৃষ্ঠা ১৩৮-৫৬

১৭ নদীয়ায় গত ছয়শত বছর যাবৎ ব্রাহ্মণদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। সমগ্র বঙ্গদেশে এ-রকম প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল দুই হাজারেরও বেশী। অথচ বিদ্যালয়-গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন পণ্ডিত ব্যক্তি পতিত জনসাধারণের জন্য প্রচলিত ভাষায় এক কথাও লেখেন নাই। এই পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের যেমন ঘৃণা করতেন, তাদের মুখের ভাষাকেও তেমনি অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। অথচ এখন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতেরাই হচ্ছেন বাংলাভাষায় সব চেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে জনপ্রিয়-লেখক।

১৮ ১৮০২ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত সরকার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য যে-সকল বই অনুমোদন করেছিলেন তাদের তালিকার দিকে নজর দিলেই বুঝা যাবে যে এর পরেও অনেককাল অবধি বাংলা সাহিত্যে উপকরণের কত অভাব ছিল।

১৯ ১৮২১ সালে অন্যূন ৪টি দেশীয় ছাপাখানা সর্বক্ষণ কাজে নিয়োজিত ছিল। তখন এ ব্যাপারটিকে একটি বিরাট কীর্তি অভিহিত করা হয়েছিল। আর ১৯৫৭ সালে সেখানে চল্লিশটিরও বেশী ছাপাখানা সক্রিয় রয়েছে এবং সেগুলিতে এক বছরেই বিভিন্ন পুস্তকের প্রায় ৬,০০,০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছে।

২০ একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা হল এই যে রাজার পরিবার সম্বন্ধে সর্বাধিক প্রামাণ্য তথ্যের জন্য আমরা বার্লিনের নিকট ঋণী। প্রুশীয় রাজার গ্রন্থাগারের একটি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি সম্প্রতি ইংরেজী অনুবাদসহ মুদ্রিত হয়েছে। এ গ্রন্থে গত শতাব্দীর এই রাজার পরিবার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

২১ কলকাতার ফারসী ও উর্দু ছাপাখানাগুলির তালিকার জন্য পরিশিষ্ট-'ছ' দ্রষ্টব্য।

২২ আগেকার দিনে পুস্তকের গড়পড়তা মূল্য ছিল নিম্নরূপ : ১৮২০ সালে পিয়ার্সনের ১০২ পৃষ্ঠার ইংরেজী-বাংলা ব্যাকরণ বিক্রয় হত দু' টাকায়। ১৮২৫ সালে বিদ্যাসুন্দর নিকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত হয়ে বিক্রয় হত ১ টাকা মূল্যে। এখন সে বই উৎকৃষ্ট কাগজে পাওয়া যায় মাত্র দু' আনা দামে। ১৮২৫ সালে 'শিশু-বোধ'-এর মূল্য ছিল ৮ আনা, এখন তার দাম ৩ পয়সা মাত্র।

২৩ সরকার সুলভ মূল্যে পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্যে গত ৪০ বছর যাবৎ স্কুল বুক সোসাইটিকে মাসিক ৫০০ টাকা অনুদান দিয়ে আসছে। কিন্তু সোসাইটি সে কাজ করা দূরে থাক, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের বিপুল খরচ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়ের দরুণ নিজেই সকল দিক থেকে দেশীয় লোকদের দ্বারা বিক্রীত হয়ে আছে। এ-বিষয়টি সম্পর্কে সোসাইটির একটি উপ-সঙ্ঘ সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে বলেছেন, "মফস্বলের দরিদ্র ছেলেরা তাদের পুস্তকের জন্য স্কুল বুক সোসাইটিকে আসল খরচের দ্বিগুণ দাম দিয়ে থাকে।"

২৪ এদের অনেকেই বছরে আট মাস বই বিক্রয় করে এবং বর্ষাকালে নিজ নিজ জমিজমা চাষাবাদের কাজে ব্যাপৃত থাকে।

২৫ ইংল্যাণ্ডে পুস্তকের বড় বড় দোকান এবং প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ প্রচার পদ্ধতি বর্তমান আছে। কিন্তু সেখানেও প্রয়োজনীয় বহুপত্র জনসমাজে পৌঁছানোর জন্যে ফেরী-ওয়ালা পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়। হ্যাম্পশায়ারে গত নয় বছর যাবৎ একটি পুস্তক ফেরীকরণ সমিতি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি চার্চ অব ইংল্যাণ্ড বুক হকিং সোসাইটি নামে একটি ফেরীকরণ ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের কুটিরবাসী, বিশেষতঃ যুব সমাজের জন্য গল্প-কাহিনী সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করে অনধিক এক শিলিং মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্য এই ইউনিয়ন ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্পর্কে সহজ ও সাবলীল রীতিতে গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত একটি পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করেছে।

২৬ আমরা এক বিধবা বৈষ্ণব স্ত্রীলোকের কথা জানি যে শুধু বাংলাভাষা ভালভাবে পড়তে এবং লিখতেই পারে তা নয়, সংস্কৃত ভাষায়ও যার বিশেষ দখল আছে এবং সংস্কৃতগ্রন্থের অনুলিপি লিখেই যে জীবিকা নির্বাহ করে।

২৭ বাঙালী লেখকদের উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে, এবং হাজার হাজার লোকের জন্য মানসিক খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে একজন লেখক এককভাবেও যে কতটা সাফল্য লাভ করতে পারেন তার দৃষ্টান্ত হিসেবে বেনারসের সরকারী বিদ্যালয়সমূহের উপ-পরিদর্শক বাবু শিবপ্রসাদ কর্তৃক সংকলিত কিংবা অনূদিত পুস্তকসমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হল।

"হিন্দী ভাষায় খোদাই করা নক্সা সম্বলিত একটি প্রথম পাঠ, যার ষষ্ঠ সংস্করণের ৫০,০০০ কপি মুদ্রিত হয়েছে।

একটি বানান শিক্ষা—পাঠ সংকলন—পাটিগণিত—পত্রলিখন শিক্ষা—জ্ঞান-কণিকা—ভূগোলপ্রবেশ—শিখজাতির উত্থান পতন—স্ব—শিক্ষক—শিক্ষক নির্দেশিকা—বিবিধ—একটি শিশুহত্যার কাহিনী—সহজ পাঠ—ভূগোল—মেয়েলী গল্প—

ইতিকাহিনী—খ্রীস্টীয় গল্প—আরও একটি খ্রীস্টীয় গল্প—সংস্কৃত থেকে অনূদিত নীতিকাহিনী—উইলসন-কৃত ঋক্‌বেদের অনুবাদের ভূমিকা—মনু থেকে সংকলিত পাঠ।

উর্দু ভাষায় : বিবিধ বিষয়—১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড—মর্টিন ও স্যাণ্ডফোর্ডের অনূদিত ভূগোল, ১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড—জীবনী সংকলন—একটি উপাখ্যান—হেনরী ও তার বাহক—ক্লিয়ন ও অশ্বের কাহিনী—প্রকৃত বীরত্ব, একটি গল্প—পরিপাক ক্রিয়া সম্পর্কে বক্তৃতা—রেলগাড়ী, একজন লেখকের লেখা সর্বমোট ৪১টি পুস্তক। লেখক সংস্কৃত ভাষায় একজন সুপণ্ডিত। বাংলায় এমন অনলস লেখক একজনও নাই।

২৮ তিন শতাব্দী আগে কালিদাস মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন। তিনি শূদ্র ছিলেন। এক শতাব্দী আগের রামায়ণের অনুবাদক কৃত্তিবাসও শূদ্র ছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণের নিন্দা করে নিম্নোক্ত অনুশাসন প্রদান করেছিলেন : "এ গ্রন্থ কোন পণ্ডিতের রচনা নয় তাই অপাঠ্য"। তাদের তর্জন-গর্জন সত্ত্বেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাংলাভাষার একটি বহুল পঠিত গ্রন্থ। তা হলেও পণ্ডিতসমাজ কখনো শূদ্র-রচিত এ রামায়ণ পড়ত না। প্রেমদাস নামক জনৈক শূদ্র-বর্ণের বৈষ্ণব নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহের রচয়িতা : চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল, চৈতন্য সঙ্গীত। শূদ্র লেখকদের মধ্যে তাঁতী সম্প্রদায়ভুক্ত নীলমণি বসাকের লেখা খুবই জনপ্রিয়। বাংলাভাষার তমসাচ্ছন্ন দিনে যারা দাস্তের মত উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছিলেন তাদের তালিকা থেকে রামমোহন রায়ের নাম বাদ দেয়ার উপায় নাই। পণ্ডিত হিসেবে ইংরেজী, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় তাঁর যে-রূপ বুৎপত্তি ছিল তাতে তিনি এ-সকল সুমার্জিত ভাষার সৌন্দর্য-চর্চায় মশগুল থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি তার "মায়ের শেখানো ভাষা"-কে অবজ্ঞা করেন নাই। এই ভাষাতেই তিনি নারী ও বিধবার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তিনি নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহেরও রচয়িতা : বৈদিক উপনিষদ—অনূদিত; বেদান্তসূত্র—অনূদিত; ভট্টাচার্য, গোস্বামী, কবিতাকার, ধর্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী ও সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীর উত্তর; পথ্যপ্রদান বা বেদান্ত ভাষ্য; সতীদাহ সম্পর্কে সভা; অবতরনিকা বা প্রাচীন ব্রাহ্মণদের ধর্মমত; ব্রাহ্মণীক্যাল ম্যাগাজিন; গুরু পাদুকা বা গুরুভক্তি; বাংলা ব্যাকরণ; গায়ত্রী বা পবিত্র মন্ত্র।

২৯ বিভিন্ন পণ্ডিতের মন কিভাবে কাজ করছে তার দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্য পরিশিষ্ট অংশে বর্ধমান থানার পোতা গ্রামের রঘুনন্দন গোস্বামীর রচিত পুস্তকসমূহের একটি তালিকা দেয়া হল। পরিশিষ্ট 'জ' দ্রষ্টব্য।

৩০ এ হচ্ছে বাংলা শৈলীর ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতির একটি প্রকৃষ্ট লক্ষণ। ডক্টর কেরী সুদীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ বিভিন্ন সংস্করণে নিউ টেস্টামেন্টের উন্নতি বিধান করার প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন এবং এটিকে তিনি বাংলা ভাষায় একটি উপযুক্ত মানের গ্রন্থ বলে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু বর্তমানে ইয়েট্‌স্-এর অনুবাদ কেরীর গ্রন্থকে পশ্চাতে ফেলে গিয়েছে এবং বাংলা ভাষার শক্তি যে কতটা বেড়েছে, এ অনবদ্য সৌন্দর্য ও বাগ্‌ধারা তারই পরিচয় বহন করছে।

৩১ মাদ্রাজ শিক্ষা বোর্ড 'অনুবাদ' শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করে একটি খুব ভাল শব্দ—'এক্সপোজিশন' [ব্যাখ্যান]-অর্থাৎ মূল পাঠের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়—অনুবাদ নয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]